ইতিকথার পরের কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্টেশনের গা ঘেঁষে কারখানার লম্বা শেড।

গেটের পাশে পিতলের ফলকেও নাম লেখা আছে–ছোট ছোট অক্ষরে। আলকাতরা দিয়ে বাইরের দেওয়ালে বিরাট বেমানান হরফে লেখা নবশিল্প মন্দির।

এই ছোট নগণ্য স্টেশনটি ঘেঁষে একক শিল্প প্রচেষ্টার অভিনবত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এত বড় হরফ সন্দেহ নেই। কিন্তু পথের সঙ্গে সমান্তরালভাবে গড়া ইটের দেওয়াল ও টিনের ছাউনিওলা লম্বাটে চালা ও লোহার চিমনিটাই সে কাজ আরও ভালোভাবে করছে, বেখাপ্পা হরফ দিয়ে এ রকম ঘোষণার কোনোই দরকার ছিল না। নজরে পড়ার মতো এ রকম আর কিছুই নেই স্টেশনে বা আশেপাশে। স্টেশনের সংলগ্ন লাল ইটের ঘর কয়েকটি যতদূর সম্ভব ছোট এবং সংক্ষিপ্ত। স্টেশন মাস্টারের দু-কামরার কোয়ার্টারটি দেখলে মনে হয় ছাদে মাথা ঠুকে যায় না তো, পা ছড়িয়ে শুতে পারে তো? পথের দু-পাশে শুধু খড় ও টিনের কতকগুলি ঘর এবং চালা, মাত্র কয়েক ঘর মানুষের বসবাস ও দোকান চালাবার প্রয়োজনে এগুলি উঠেছে। কাছাকাছি নাগালের মধ্যে বড় গ্রাম নেই। স্টেশনের লাগাও বসতিটার মতোই এখানে ওখানে থোপা থোপা বসানো ছাড়া ছাড়া বসতি, ছোট ছোট কাঁচা কতকগুলি ঘরের সমষ্টি। গ্রাম অবশ্যই আছে, বাংলার সর্বত্রই ঘন ঘন গ্রাম। স্টেশন থেকে একটু দূরে দূরে পড়েছে গ্রামগুলি। যেন সযত্নে হিসাব করে সমস্ত বড় বড় গ্রাম থেকে যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখতেই স্টেশন করার জন্য এই স্থানটি বেছে নেওয়া।

আসলে কিন্তু তা নয়। এখান থেকেই বারতলার জমিদার বাড়ি সব চেয়ে কাছে হয়, মাইল চারেক। অন্য গ্রামের হিসাব ধরাই হয়নি। স্টেশনের নামও বারতলা।

দু-পাশের স্টেশন দুটি বারতলা থেকে বেশি দূরে দূরে নয়। ওই দুটি স্টেশন থেকেই এই এলাকার বেশির ভাগ গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা। বারতলায় ভাই যাত্রীর ভিড় হয় না। প্ল্যাটফর্মে হাঁটলে চোখে পড়ে এখানে ওখানে ঘাসের চাপড়া গজিয়ে আছে লাল কাঁকর ঢেকে দিয়ে। স্টেশন থেকে বারতলা পর্যন্ত সিধে রাস্তার দুপাশের কয়েকটি ছোট খাটো গ্রাম আর ওই বারতলার যাত্রীরাই শুধু এই স্টেশন ব্যবহার করে।

রাস্তা করার সময়েও অন্যান্য বড় গ্রামগুলির কথা ভাবা হয়নি–জমিদার যেখানে বাস করে সেই বারতলা গ্রামটি ছাড়া যেন রাস্তাঘাটের প্রয়োজন অন্য গ্রামের নেই।

ভিড় হয় বর্ষাকালে। আশেপাশে এই রাস্তাটিই বর্ষাকালে কাদা শূন্য থাকে। খানিকটা বেশি পথ হাঁটতে হলেও অনেক গ্রামের লোক তখন এই স্টেশন দিয়েই যাতায়াত করে, কর্দমাক্ত পিছল পথে হাঁটা যতটা সম্ভব কম করার জন্য।

যুদ্ধের সময় ছোটবড় সব শিল্প যখন মেকি ঐশ্বর্যের গরমে খুব ফুলছে, তখন বারতলার জমিদার জগদীশের ছেলে শুভময়ের দুঃসাহসী স্বপ্ন এই কারখানার রূপ নেয়। আত্মীয়বন্ধু নিষেধ করেছিল। টাকা ঢালতে চাও, নবশিল্প গড়তে চাও, শহর থেকে এত দূরে কেন? শহরের চারিদিক বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল, এমন কত স্টেশন আর রাজপথের ধারে কত জমি সস্তায় বিকিয়ে যাবার জন্য সাইনবোর্ড বুকে নিয়ে পতিত হয়ে আছে। একটা সুবিধামতো স্থান বেছে নিয়ে টাকা ঢালো, কারখানা করো, ভবিষ্যৎ আছে। এত দূরে এখানে কি এ সব কারখানা চলে? সে রকম বড় কারখানা হয়, যাকে ঘিরে আপনা থেকে একটা লোকালয় গড়ে ওঠে, ওয়াগন বোঝাই হয়ে হয়ে কাঁচামাল আসে আর তৈরি মাল চালান যায়, সেটা হয় আলাদা কথা। স্টোভ ল্যাম্প লণ্ঠনের মতো টুকিটাকি জিনিসের কারখানা এখানে চলতে পারে না।

আত্মীয়বন্ধু কেন চারিদিকের জীবন ও পরিবেশও যেন তাকে একবাক্যে নিষেধ করেছে, এখানে নয়, এখানে কিছু হবে না। মনুষ্যত্ব ছাড়া কিছু নেই এখনকার মানুষের। মানুষ যে প্রকৃতিকে জয় করেছে, মানুষ যে পশু নেই, তার আদিম কিছু প্রমাণ শুধু মেলে লাঙল দিয়ে জমি

চষায়, তাঁত বোনায়, মাটির হাঁড়িকলসি গড়ায়, কুঁড়েঘরে উনানের আঁচে লোহা তাতিয়ে কামারের হাতুড়ি ঠোকায়। দুঃখ দৈন্য রোগ শোক ক্ষুধা আর উগ্র অসন্তোষ নিয়ে মানুষ বাস করে, মনের আদিম অন্ধকারে পথ হাতড়ায়। বর্ষায় ঘর ভাসে, খরায় মাঠের ফসল জ্বলে যায়, ডোবা পচে, মশার ঝাঁক ওড়ে, প্রতিটি দিনের সঙ্গে শেষ হয় পথের অভাবে মাঠ ভেঙে চলাফেরা আর স্কুল শিথিল কাজকর্ম, তেলের অভাবে সন্ধ্যাবেলাতেই সন্ধ্যাদীপ নিভে গিয়ে শুরু হয় নিষ্ক্রিয় ঝিম-ধরা দীর্ঘ রাত্রি। কী দিয়ে রচিত হবে নবশিল্প?

তবু শুভ থামেনি। কে জানে পল্লীমায়ের শান্ত মধুর স্নেহসিক্ত বিষাদের হতাশা থেকে জিদ এসেছিল কি না। শহর থেকে দূরেই নবশিল্প গড়া দরকার। দূরত্ব? রেললাইনের ধারে পঞ্চাশ–ষাট মাইল কীসের দূরত্ব? মজুরের অভাব কীসের? ভূমিহীন কত চাষি উপোস দিচ্ছে, দলে ভিড়ে, আন্দোলন আর হাঙ্গামা করে ক্ষুধার্ত বাঘের মতোই মরিয়া নিষ্ঠুর থাবার ঘায়ে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে সমাজ সংসার। ওদের একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে মজুরের অভাব হবে না। মজুরি পেয়ে ওরাও বাঁচবে, শান্ত হবে।

যুদ্ধের সময়টা বেশ চলেছিল কারখানা। বারতলা আর আশেপাশের গাঁ থেকে যারা প্রাণ বাঁচাতে শহরের শিল্পাঞ্চলে গিয়ে কারখানায় ঢুকেছিল, তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক ফিরিয়ে এনেছিল জগদীশ। বিদেশে কেন, ঘরে বসে তার ছেলের কারখানায় খেটে রোজগার করবে। তাছাড়া গড়ে মেঝে তৈরি করেছিল স্থানীয় কিছু আনাড়ি ভূমিহীন চাষিকে। যুদ্ধ থামার পর ক্রমে ক্রমে কারখানাও থেকে এসেছে। প্রকট হয়েছে একটা সত্য, শিল্পরানি অসতী নয়। কোটিপতি পতি ছাড়া কারও দাসীত্ব সে করবে না। পতি চাইলে তবেই দুদিনের জন্য একটু ভাব করবে ছুটকো মাঝারি প্রেমিকের সঙ্গে, আসলে তার পতি–অন্ত প্রাণ।

রাত নটার গাড়ি আসছে। চাঁদের আলোয় খানিকটা আলো হয়েছে চারিদিক, স্টেশনের বাতি কটা টিমটিম করে জ্বলছে। কুয়াশার সঞ্চারটা অস্পষ্ট অনুভব করা যায়। এখনও ভালোভাবে চোখে ধরা না পড়লেও টের পাওয়া যায় যে ধীরে ধীরে ঘন কুয়াশাই নামছে।

রাত্রির এই গাড়ি থেকে দু–তিনজনের বেশি যাত্রী কোনোদিনই নামে না। কোনোদিন গাড়িটা শুধু একটু থেমে দাঁড়িয়ে একটি মানুষকেও নামিয়ে না দিয়ে সিটি মেরে চলে যায়। স্টেশনের বাইরে অন্য দোকান কটি আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, আলো জ্বলছে শুধু দুটি দোকানে। গজেনের পান বিড়ি ও চিড়েমুড়ির মেশাল দোকান এবং সনাতনের দেশি খাবার ও তেলেভাজার দোকান। সব গুছিয়ে ঠিকঠাক করে দোকান বন্ধের আয়োজন করে রেখেছে দুজনেই। গাড়ি থেকে কেউ নামে কি না, কিছু কেনে কি না দেখেই ঝাঁপ বন্ধ করবে।

সনাতন এখানেই থাকে, দোকানের পিছনটায় তার বাস। গাড়ি আসবে বলে প্ল্যাটফর্মের বাতি কটা জ্বালানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরের ঘরে সুরমা কুপি জ্বালে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে নয়, দোকানের আলো থেকে ছেঁড়া এক টুকরো কাগজ জ্বেলে নিয়ে। রাত্রে পেটপূজার বাকি আয়োজনটুকু সেরে ফেলবে। রাত্রে তারা দুজনে একসাথে গল্প করতে করতে খায়। কপালে যেদিন যা জোটে, সেদিন তা খায়। কুপি জ্বালাবার সময় গজেন বেদনায় মুখ বাঁকিয়ে বলে, "ও মামি পা-টা বড় টাটাচ্ছে গো। ঘরে আজ ফিরতে পারব না। একটু ভাগ দিয়ো, তোমার খেয়ে তোমার ঘরে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব। কী করি!"

সনাতন বোঝে না, সত্যই ধরে নেয় গজেনের খোঁড়া পা-টা ব্যথা করছে। তাদের ঘরে শুয়ে রাত কাটাবার কথাটা যোগ না দিলে ধরতে পারত না সে তামাশা করছে, বিপাকে পড়ে যেত। নিজের দোকানঘরটা থাকতে তাদের ঘরে রাত কাটাবার কথা বলায় তামাশা ফাঁস হয়ে গেছে তার কাছে। সে বলে, "বেশ তো ভাগনে, খেয়ো। পেঁয়াজকলির চচ্চড়ি রেঁধেছি। আমার সাথেই শুয়ো।"

তামাশার জবাবে তামাশা কিন্তু একটুও হাসে না সুরমা। কুপি জেলে পিছনের ঘরে যায়। কাঁচা–পাকা বাবরি চুল পিছনে ঠেলে দিয়ে খোঁড়া পায়ে একটা থাপ্পড় মেরে হাসি মুখে বিড়ি ধরিয়েছিল গজেন। না, মেয়েটা সত্যি চালাকচতুর। নইলে এই অচল অবস্থায় স্টেশনের ধারে এই চালাঘরে একগুঁয়ে সনাতনকে নিয়েই শেষ পর্যন্ত একটা সুখের নীড় গড়তে পারত!

তার বড় মেয়ের বয়সি হবে সুরমা। তবু তাকে সে মামি বলে ডাকে। কারণ সনাতন দূর সম্পর্কে তার ভাগনে হয়। দূরে গাড়ির আলো দেখা গেলে সেদিকে চেয়ে সনাতন চিন্তিতভাবে বলে, "পা-টা হঠাৎ টাটাল যে মামা?"

"গুলির চোটে ঠ্যাং খোঁড়া হলে মাঝে মাঝে অমন টাটায়। তুই কী বুঝবি?"

"ঝাঁপ আমি লাগাবখন মামা। তুমি এসে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো। একটা মালিশ টালিশ হলে–"

গজেন বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বলে, "তুই সত্যি গোমুখ্যু সনাতন!"

সশব্দে ট্রেনটা এসে থামে। আওয়াজ শুনে খেঁকি কুকুরটা এসে দাঁড়িয়েছে দোকানের সামনে, খাবার কিছু কেনাকাটা হলে পাতাটা চাটতে পাবে। সম্প্রতি বাচ্চা পেড়েছে, সমস্ত শরীরটা চামড়া ঢাকা কঙ্কালের মতো শীর্ণ, শুধু আকণ্ঠ খিদের আগুন। জালা পেটটার নীচে ঝুলছে সরস দুধে ফুলে ওঠা স্তনগুলি। একজন যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা চলে যায়।

"মোটে একজন?" সনাতন চটে বলে, "দ্যুৎ! একঘণ্টা বসে থাকাই সার হলো।"

"কেন, দশ–বারোগণ্ডা পয়সা বেচলি না?"

তা বটে। এই শেষ গাড়ির আশাতেই কী আর তারা দোকান খোলা রেখেছে এতক্ষণ। গাঁয়ে হাঁটা পথিক খদ্দের দু-চারজন না জুটলে আটটার গাড়ি বেরিয়ে গেলেই ঝাঁপ বন্ধ করত। মাথা ঢেকে গায়ে চাদর জড়ানো যাত্রীটির। চেনা না গেলেও বোঝা যায় বয়স্ক ভদ্রলোক। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, তাদের দোকানের দিকে এক নজর তাকিয়ে পা বাড়ায়। কিছু কেনার তাগিদ নেই।

গজেন ডেকে বলে, "বাবু যাবেন কোথা? পান বিড়ি নিয়ে যান, আর পাবেন না।"

"বারতলা যাব। পান বিড়ি খাই না বাবা।"

সনাতন চেষ্টা করতে ছাড়বে কেন? সে চেঁচিয়ে বলে, "সে তো দু–কোশ পথ বাবু। নতুন গুড়ের ভালো সন্দেশ ছিল, দুটো মুখে দিয়ে যান। এত রাতে গাঁয়ে কিছু মিলবে না কিন্তু।"

খানিক দূর এগিয়ে গিয়েছিল মানুষটা, থমকে দাঁড়ায়। গটগট করে ফিরে এসে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, "কে ডাকলে সন্দেশ খেতে? নতুন গুড়ের সন্দেশ! সব ব্যাটা সন্দেশ খাওয়ালো, বাকি আছ তুমি! জীবনভর জেল খাটিয়ে ঢের সন্দেশ খাইয়েছ, বুড়ো বয়সে আর তামাশা কেন বাবা?"

মাথা থেকে চাদরটা খসে গেছে। বয়স ষাটের কম হবে না। গায়ের লোম ওঠা মোটা গরম চাদরটিতে বাড়িতে আপন হাতে সস্তায় সাফ করার চেষ্টাটা খুব স্পষ্ট, সাবান-কাচা ধুতি ও জামাটিতেও ইস্ত্রিহীনতার দীনতা। পায়ে বাদামি রঙের ক্যাম্বিশের জুতো। দোকানের আলোয় গভীর শ্রান্তি ও অবসাদের সঙ্গে তীব্র বিরক্তি মেশানো তার থমথমে মুখ দেখে সনাতন চুপ করে থাকে।

গজেন বলে, "ছি ছি, তামাশা কীসের? রাত হয়েছে, গাঁয়ের দিকে খাবার-টাবার জুটবে না, তাই বলা-"

তবু গরম মেজাজ নরম হয় না ভদ্রলোকের।

"হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, সব জানি। তাই বলা যে সন্দেশ খেয়ে যান! লোক দেখে টের পাও না লাটবেলাটের গদি পায়নি, লাখ দুলাখের পারমিট পায়নি? খেতে জোটে না, ঠাণ্ডা রাতে পায়ে হেঁটে চার মাইল পাড়ি দিচ্ছে, সন্দেশ খাবে! যারা সব গুছিয়ে নিয়ে বসেছে, তাদের ডেকে সন্দেশ খাইয়ো। আমাকে কেন!"

পাগলাটে বুড়োর কথা বাচালতা মনে হয় না, জোরের সঙ্গে গুছিয়ে বলার ভঙ্গিটা সুন্দর, বক্তৃতার আমেজ আছে! ঝাঁঝটা সত্যই আন্তরিক। গজেন বলে, "আপনারে চিনি চিনি মন করে-"

"চিনি চিনিই মন করবে। এখন আর চিনবে কেন? দরকার কী!"

মানুষটা আর দাঁড়ায় না, হনহন করে চলতে শুরু করে। ধীরে ধীরে কুয়াশা ঘন হচ্ছে, আরও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে জ্যোৎস্না। দেখতে দেখতে সেই কুয়াশার সঙ্গেই ছায়ার মতো মানুষটা মিলিয়ে যায়। সুরমা বলে, "কী মেজাজ গো বাবা! সত্যি চেনা নাকি?"

গজেন বলে, "চেনা চেনা যেন লাগল।"

সনাতন এতক্ষণে বলে, "ভাবলাম দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দি। অত মুখ কীসের? তা, কেমন যেন মায়া হলো!"

সুরমা হেসে বলে, "মায়া হলো তো মাগনা দুটো সন্দেশ খাইয়ে দিলে না কেন?"

গজেন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে। তাকেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাড়ি দিতে হবে এই পথে। ছোটখাটো যে চাষিপাড়ায় তার ঘর, এখান থেকে এক মাইল পুরো হবে না। কিন্তু নেংচে নেংচে গিয়ে পৌঁছতে তার প্রায় একঘণ্টা লেগে যাবে। পয়সার থলিটা কোমরে বাঁধা ছিল, চালের ছোট্ট পুঁটুলিটা ছেঁড়া চাদরের আস্ত কোণটাতে বেঁধে নিয়ে কাঁধে ফেলে, বেগুন দুটোর বোঁটা বাঁকিয়ে কোমরে গুঁজে দু-হাতে মোটা লাঠিটা বাগিয়ে ধরে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রওনা দেয় ঘরের দিকে। দিনের বেলা এখান থেকে তার ঘরের পাশের তালগাছ কটা চোখে পড়ে। গুলি লেগে পা-টা খোঁড়া হবার আগে কত সংক্ষিপ্ত ছিল এই পথটুকু। দিনে দশবার যাতায়াত করলেও মনে হত না পথ হাঁটা হয়েছে। আজ কত দীর্ঘ হয়ে গেছে পথটা তার কাছে। পাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গজেন পথের পাশ থেকে ডাক শোনে, "কে যায়? একটু শোনো ভাই, শুনে যাও।"

মনে হয় সেই মানুষটার গলা, তবু গজেন শক্ত করে মোটা লাঠিটা বাগিয়ে ধরে। ঠাহর করে দেখে বুঝতে পারে সামনে অল্প দূরে পা ছড়িয়ে বসে আছে একটা মানুষ–মনে হয় সেই মানুষটাই। তবু সেইখানে দাঁড়িয়ে গজেন জিজ্ঞাসা করে, "কে?"

"আমি রে বাবা, আমি! ভয় নেই, একটু এগিয়ে এসো।"

"আপনি ইস্টেশান থেকে এলেন না?"

"হাঁ, হাঁ, স্টেশন থেকে এলাম। তুমিই আমাকে সন্দেশ খেতে ডেকেছিলে নাকি? রাগ করিস না বাবা, বড় বিপাকে পড়েছি!"

গজেন কাছে এসে বলে, "আজ্ঞে না, আমি সে নয়। মোর পান–বিড়ির দুকান। আপনার হলো কী?"

ভদ্রলোক বলে, "আর হলো কী, মন্দ কপালে যা হবার তাই হলো, গর্তে পড়ে পা মচকে গেল। ভেঙেছে কিনা কপাল জানে। এখন করি কী? রাস্তার ধারে পড়ে মরা অদেষ্টে ছিল শেষকালে!"

গজেন বলে, "রাম রাম, মরবেন কেন। মানুষের জগতে মানুষ এমনি করে মরতে পায়?" একটু ভেবে বলে, "হাঁটতে পারবেন না আস্তে আস্তে? টেনেটুনে দেব পা–টা? মোদের পাড়া এই খানিকটা পথ হবে।"

ঘর ছিল, টিন যখন সস্তা ছিল এবং পাওয়া যেত সেই সময় করা হয়েছিল–পুরানো ঝাঁঝরা হয়ে গেলেও ইদানীং আর টিন না জোগাতে পেরে সে দুটোরও খড়ের চালা হয়েছে। পশ্চিমের ডোবার ধারে চারখানা ঘর ছিল অন্য ঘরগুলি থেকে একটু তফাতে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে গত দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়। সে ঘরগুলি আর ওঠেনি।

লোচনের ঘরের ঢাকা দাওয়ায় তাকে বসিয়ে বুড়ো রসিক অন্ধকারেই নানাকথা বলে যায়। এই চাষিপাড়ায় সেই সবার চেয়ে মান্যগণ্য। পাড়ার মেয়েপুরুষ অনেকেই এসে হাজির হয়েছে। কে এসেছে ক-জন এসেছে অন্ধকারে ঠাহর করা যায় না। শুধু কথা বললে গলার আওয়াজ থেকে মানুষটা কে বুঝে নেওয়া চলে। রাস্তার কথাই বলে রসিক। সাধে কী গর্তে পা পড়েছে ভদ্রলোকের, সারা রাস্তায় শুধু গর্তের ফাঁদ পাতা। কারও মাথা–ব্যথা নেই রাস্তার জন্য। অমন পয়সাওলা জমিদার বারতলার, তার গ্রামের নামে স্টেশনের নাম, কারখানা তুলতে অত টাকা নষ্ট করতে পারে, রাস্তাটা ঠিক করার দিকে নজর নেই।

"গর্তে পড়ে মোদের নয় ঠ্যাং মচকাল একবার দুবার। দামি গাড়ির চাকা ভাঙবে কার?"

কথা বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে রসিক ঝেঁঝে ওঠে, "লেন্টানটা আন না বাবা কেউ? একটু চুন–হলুদ করতে যে রাত কাবার হলো।"

মেয়েলি গলায় জবাব শোনা যায়, "লেন্টান নিয়ে গেছে। পিদিম জ্বাললে হয়।"

রসিক বলে, "হয় তো জ্বাল না কেনে পিদিম একটা ছোটবউ?"

মেয়েলি গলায় তেমনি ফিসফিস আওয়াজে দৃঢ় স্পষ্ট জবাব আসে, "বলে দিলেই পিদিম জ্বলে! কে এল না কে এল, আলো জ্বালবে না আঁধার রইবে জানবো কীসে?"

মোটা সলতের বড় প্রদীপ জ্বলে উঠে দাওয়ার অন্ধকার দূর করে। শাঁখা-পরা হাত তিলচিটে ভাঙা কাঁসার গ্লাসটা আগন্তুকের সামনে উপুড় করে রেখে তার উপর প্রদীপটা বসিয়ে দেয়, আঙুল দিয়ে উসকে দেয় সলতে। রসিক এক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে থেকে নিজের দুই কান মলে

ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলে, "হা রে আমার পোড়া কপাল, আপনি জীবনবাবু! এতক্ষণ কথা কইলাম, গলা শুনে চিনলাম না? আরে ও গজেন, তুইও চোখের মাথা খেয়েছিস, জীবনবাবুকে চিনলি না?"

গজেন সোজা তাকিয়ে থাকে দাওয়ার বাইরের অন্ধকারের দিকে, গুলিতে পঙ্গু পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে রুক্ষ কঠোর সুরে বলে, "না, চিনলাম আর কই? চিনি চিনি করেও তো চিনলাম না। চিনলে কী আর খোঁড়া পা নিয়ে উঠিপড়ি খবর দিতে ছুটে আসতাম? যেথায় থাকা উচিত ছিল সেথায় পড়ে রইত তোমার জীবনবাবু।"

চারদিক থমথম করে। গজেন এসে শুধু খবরটাই দেয়নি, পাশের গাঁ থেকে নন্দ ডাক্তারকে ডেকে আনার প্রস্তাবও সে করেছিল। লণ্ঠনটা নিয়ে ডাক্তার ডাকতে লোক চলে গেছে। বিদেশি একজন ভদ্রমানুষ তাদের দেশ গাঁয়ে এসে বিপাকে পড়েছে, এটুকু না করলে তাদের মর্যাদা থাকে না। শুধু পা মচকানোর জন্য ডাক্তার! এটা তার বাড়াবাড়ি মনে হলেও কৈলাসকে পাঠানো হয়েছে নন্দ ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্য।

কারণ গজেন আরও একটা যুক্তি দেখিয়ে বলেছিল, "পায়ে যখন গুলি লাগল কী যে না করেছিল বাবুরা মোর জন্যে? তাদের জন্যই তবু খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারি।"

চাষিরা শোভাযাত্রা করে শহরে গিয়েছিল, সেই পুরানো ঘটনা। তাই বটে! তাই বটে! তাদের সকলের প্রাণের মানুষ রসিককেও শহরের এক ভদ্রবাড়ির অন্তঃপুরে লুকিয়ে রেখে মেয়ে বউরা সেবা করে বাঁচিয়েছিল, হাসপাতালে গেলে একেবারে জেল ঘুরে কতদিনে সে ফিরত কে জানে! শহরের বিদেশি মানুষটার জন্য যথাসাধ্য করতে হবে বইকি। গজেন ঠিক বলেছে।

সেই গজেনের মুখে এই কথা! চিনতে পারলে জীবনকে সে পথের ধারেই পড়ে থাকতে দিত।

জীবন খানিক স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে, "দেখলে তো রসিক? শুনলে তো কথা? সারা জীবন জেল খেটে আর ত্যাগ করে কপালে কী পুরস্কার জুটেছে দেখলে তো? আমি তো বাবা তোর ঠ্যাং খোঁড়া করিনি।"

"গদি পেলে করতেন।"

মৃদু হাসির একটা গুঞ্জন উঠেই থেমে যায়, সে হাসির নিষ্ঠুরতা প্রকট হয়ে পড়ে তাদের কাছেই। একজন শ্রান্ত আহত জীবন্ত মানুষ, অর্ধেকের বেশি চুল সাদা হয়ে গেছে, মুখে পড়েছে জীবনব্যাপী দুঃখ ও দারিদ্রের রেখা। তর্ক চলে, মানুষটার উপস্থিতি অবলম্বন করে প্রকাশ করা চলে প্রাণের জ্বালা, কিন্তু সামনাসামনি তাকেই কী আর বিদ্রুপ করা যায়!

এ মানুষটার জ্বালাও কম নয়। স্টেশনে নতুন গুড়ের সন্দেশ কিনতে বলা নিয়ে তার তেড়ে রুখে ওঠার গল্প গজেন সকলকে শুনিয়েছে। দাওয়ায় এসে বসার পর কথায় কথায় কতভাবে যে বেরিয়ে এসেছে বঞ্চিত মানুষটার অন্তরের জ্বালা। তবে তাদের জ্বালা এর জ্বালায় যেন বিষ আর আগুনের ফারাক। লক্ষ কোটি মানুষের জগতটা এর একার জীবনের ব্যর্থতার আপশোসে আড়াল হয়ে গেছে। নইলে এতক্ষণে একবার জিজ্ঞাসা করে না বিশ বছর আগেকার দেশ–গাঁ ও কর্মক্ষেত্রের খবরাখবর, পুরানো দিনের চেনা মানুষের কুশল? বিশ বছর আগে এদিকে তার আন্দোলনে রসিক ছিল তার বড় সহায়, ছায়ার মতো মুখের কথায় ওঠা-বসার ভক্ত সাথি ছিল অল্পবয়সি গজেন–আজ বুঝি সে সব কথা তার মনেও নেই। জীবনের সব স্মৃতি তুচ্ছ হয়ে গেছে দুঃখ ও ত্যাগের প্রতিদানে কী পায়নি তারই হিসাব ছাড়া।

গজেন বলে, "কী হলো চুন হলুদ? আজ রাতে গরম হবে?"

অল্পবয়সি একটি বউ গরম চুন হলুদের বাটি এগিয়ে দেয়। জীবন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করে, গাঁয়ের কচিবউদের ঘোমটা কী অদ্ভুত রকম হ্রস্ব হয়ে গেছে? এতগুলি পুরুষ ও বিদেশি একটা মানুষের সামনেও, মুখ পর্যন্ত দেখা যায়। এ অবস্থায় একদিন এই বউটিরই বুকের কাপড়ে টান পড়িয়েও একগলা ঘোমটায় মুখটা আড়াল না করা ছিল নিন্দার কথা।

রসিক বলে, "ডাক্তার এসে পড়বে এখুনি, চুন হলুদটা থাকত, না কি বল?"

গজেন বলে, "গরম গরম লাগিয়ে দিলে আরাম হবে। ডাক্তার এলে তুলে ফেলতে কতক্ষণ?"

কিন্তু চুন হলুদ পায়ে লাগাবার আগেই সাইকেলের ঘণ্টা শোনা যায় নন্দ ডাক্তারের, টর্চের জোরালো আলো নজরে পড়ে।

নন্দর বয়স বেশি নয়, রোগা লম্বা চেহারা। সে দাওয়ায় উঠে পিঁড়িতে বসলে রসিক পরিচয় দিয়ে বলে, "ইনি বড়গাঁর জীবনবাবু। স্টেশন থেকে আসছিলেন, গর্তে পড়ে পা-টা মচকে গেছে।"

অনেককাল আগে গাঁ ছেড়ে শহরে বড়ছেলের কাছে চলে গেলেও এ এলাকায় এখনও লোকে তাকে বড়গাঁর জীবনবাবু বলে চেনে।

জীবন বলে, "তুমি নারাণ কর্মকারের ছেলে না? দ্যাখো তো বাবা হাড়টাড় ভেঙেছে নাকি। পাশ করে গাঁয়েই বসেছ?"

"পাশ করিনি। বিয়াল্লিশে জেলে গেলাম, এদিকে বাবা মারা গেলেন, পাশ করা হলো না।"

বোঝা যায় সে পাশ–করা ডাক্তার নয় বলে জীবন বেশ ক্ষুণ্ন হয়েছে। গেঁয়ো ডাক্তার নন্দ তার পা টিপেটিপে টেনেটুনে পরীক্ষা করে, জীবন মাঝে মাঝে কাতরায়। বেশ ফুলেছে জায়গাটা। এতক্ষণ সে যে একবারও কাতরায়নি এটা খেয়াল করে সকলে মনে মনে তার সহ্যশক্তির প্রশংসা করে।

"হাড় বোধ হয় ভাঙেনি।"

"বোধ হয় ভাঙেনি? জীবন প্রায় ধমকে ওঠে, বোধ হয় কী রকম? ঠিক করে বলো!"

পায়ের গোড়ালি থেকে টর্চের আলোটা একবার তার মুখে ফেলে ধীর গলায় নন্দ বলে, "গেঁয়ো ডাক্তার, এর বেশি তো বলতে পারব না। বড় হাড় ভাঙেনি, এইটুকু জোর করে বলতে পারি। ছোট হাড় ভেঙেছে কি না এক্স-রে না করে স্পেশালিস্টও বলতে পারবে মনে হয় না।"

জীবন লজ্জিত হয়ে বলে, "কিছু মনে করো না বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো। মন মেজাজ ঠিক থাকে না আজকাল। বড় ছেলেটা মারা গেল, ক–বছর কী দিয়ে কী করি, কোন দিক সামলাই–"

জীবন একটা নিঃশ্বাস ফেলে। সকলে চুপ করে শোনে।

"বুড়ো বয়সে কত সয় বলো? দেশের ঘর আর জমিটুকু জগদীশ কিনে নেবে লিখল–তা লিখল একেবারে শেষ মুহূর্তে। কালকেই নাকি কোথায় চলে যাবে। বিবেচনাটা দ্যাখো একবার! কেন রে বাবা, দুদিন আগে জানাতে তোর হয়েছিল কী? রাতের বেলা এসে নইলে আমার এ দশা হয়।"